সাহিত্য পত্রিকা

তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬
বাংলা বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Vol. 43 | No. 2 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের প্রবন্ধ : বিষয়বৈচিত্র্য ও গদ্যশৈলী

Volume	43
Issue	2
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু হেনা মোস্তফা এনাম
Published online	May 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v43i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i2.6
Pages	89-105
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০

Check for updates

নজরুলের প্রবন্ধ : বিষয়বৈচিত্র্য ও গদ্যশৈলী

আবু হেনা মোস্তফা এনাম*

এক

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) অন্তর্মগ্ন আবেগে, সংবেদনায় কবিসত্তার একনিষ্ঠ আন্তরধর্মে যথার্থ অর্থেই প্রথম মৌলিক কবি। কিন্তু তিনি কেবল কবিতা রচনা করেন নি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীব্যাপী সামূহিক অবক্ষয়-অত্যাচারের এবং রক্ষণশীলতার অচল-অটল স্তম্ভ ধ্বংসের সূচনায়; নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে বৈষম্যহীন সমাজবিন্যাসের বাসনায়, প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, ক্ষোভ-যন্ত্রণা-বিদ্রোহকে বাস্তব রূপ দানের জন্য এবং জীর্ণ-পুরাতনকে ভেঙে নতুন সমাজ নির্মাণের অঙ্গীকারে অন্তরচৈতন্যের প্রতিবাদী সত্তার তীব্র আলোর সম্পাতে রচনা করেছেন প্রবন্ধ। নজরুলের প্রাবন্ধিক অস্তিত্বের বিকাশ-পরিবর্ধন মূলত সম্পাদকীয় রচনার প্রেরণায় এবং অনেকাংশে বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত অভিভাষণের শাব্দিক বিন্যাসে। যে কারণে স্বল্পসংখ্যক এবং ক্ষীণায়তনিক হলেও তাঁর প্রবন্ধ সমকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রাবন্ধিক সত্তার প্রাজ্ঞ জীবনবোধ এবং প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) জাতিক এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য-অভিজ্ঞান অথবা মননশীল জীবনের সৃষ্টিময় উচ্চমার্গ সঞ্চারী নয়। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ও নিজস্ব ব্যক্তিত্বমণ্ডিত মোহনীয় শাব্দিক আবেগরাশির স্রোতে ভেসে যায় সমস্ত প্রাবন্ধিক ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত গদ্যভঙ্গির যৌক্তিক কাঠামো অথবা ইংরেজি, ফরাসি সাহিত্যের নিবিড় অধ্যয়ন, পেইন্টিং, সংগীত শ্রুতিমধুরতা, ঠাকুর পরিবারের বিদগ্ধ পরিবেশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদীক্ষা-কথনকৌশল ও বস্তুজ্ঞানচৈতন্যের নির্যাস আহরণে কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরীর *সবুজপত্র* (১৯১৪) আশ্রয়ী বাংলা কথ্যরীতির পরিমার্জিত বিন্যাসকৌশল নজরুলের অন্বিষ্ট নয়, তিনি তার চর্চাও করেন নি; বরং সমাজসচেতনতা ও কালিক প্রয়োজনে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনার তাগিদে প্রবন্ধ রচনা করলেও কবিসত্তার আবেগধর্মে বিষয়-সংলগ্নতার সূত্রে কবিতার মতোই তাঁর প্রবন্ধেও সংগ্রথিত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে জাতিক-আন্তর্জাতিক পুরান-ঐতিহ্য-ইতিহাস ও লোকজ কথামালা। যে কারণে তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনাপ্রবাহ-বিষয় এবং গদ্যকাঠামো স্বতন্ত্র একটি চিহ্নায়নের স্রোত-মুখী।

নজরুলের প্রাবন্ধিক গদ্যকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে “শ্রেণীকরণ করা যায়।

ক. প্রবন্ধ গ্রন্থ

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ড. মালিকা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

খ. অগ্রন্থিত প্রবন্ধ
গ. অভিভাষণ
ঘ. গ্রন্থ সমালোচনা
ঙ. চিঠিপত্র

গদ্য-রচনার এই বৈচিত্র্যের মধ্যে নজরুল ইসলামের মানস-ভঙ্গি, জীবন-সম্পর্কিত ধারণা, সমকালীন সমাজের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য, ধর্ম সম্পর্কিত মনোভাব, বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ ও সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।"[১] উপযুক্ত শ্রেণীকরণে নজরুলের গদ্য-রচনার পরিসর-অন্তর্গত প্রবন্ধের (প্রবন্ধ গ্রন্থ, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অভিভাষণ) বিষয়বৈচিত্র্য এবং গদ্যশৈলী বিচারই এই আলোচনার অন্বিষ্ট।

নজরুলের সম্পাদকীয় রচনা এবং অভিভাষণের আবেগময় কথামালার স্বগতকথনের ভাবনানুষঙ্গ, বক্তব্যানুভূতির অন্তর্কাঠামোর অভিব্যক্তি ঘটেছে সান্ধ্যদৈনিক *নবযুগ* (১৯২০); অর্ধসাপ্তাহিক *ধূমকেতু* (১৯২২); সাপ্তাহিক *লাঙ্গল* (১৯২৫); *গণবাণী* (১৯২৬); *সওগাত* (১৩২৬ *?*); *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা* ইত্যাদি পত্রিকায়। পরবর্তীকালে এগুলি *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী*,[২] *দুর্দিনের যাত্রী*,[৩] *রুদ্র-মঙ্গল*[৪] ইত্যাদি প্রবন্ধ সংকলনে গ্রন্থবদ্ধ এবং অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও অন্যান্য রচনা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আব্দুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী* প্রথম ও চতুর্থ খণ্ডে সংযোজিত, সংকলিত।

দুই

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়পর্বে পৃথিবীব্যাপী উত্তাল-উত্তাপ, সামূহিক অবক্ষয়, অত্যাচার, রক্তপাত আর ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন পৃথিবীর স্বপ্ননির্মাণ, রুশ বিপ্লব, অন্যদিকে সমকালীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পীড়নে শৃঙ্খলিত মানব মুক্তির প্রত্যাশায় খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), স্বাধীনতা সংগ্রাম, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৭), গণতান্ত্রিক সমাজচেতনা ও কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমদের সাহচর্যের প্রভাব — ইত্যাদি ঘটনার অভিঘাত ও উপলব্ধি থেকে নজরুল ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন রুদ্ররোষের দ্রোহকণ্ঠ। সচেতন রাজনীতিজ্ঞানচৈতন্যের অভিনিবেশে নজরুল স্বকালের জাতিক-আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-আন্দোলন-আলোড়ন-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-দুর্বলতায় তাঁর প্রাণস্পর্শী লোকায়ত-পৌরাণিক-আবেগিক শব্দরূপের গতিসংযোজন-সামর্থ্যের বেগে-ভাবাবেগে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আঘাতে-আহ্বানে জাতিকে যুগের নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি এই যুগকে 'মহাজাগরণের'; 'মহাআনন্দের' এবং 'মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন' বলে বিবেচনা করেছেন। এবং এই নবজাগরণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মহাবিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মার অন্তর্স্রোতে —

> এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশীর সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান, — জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।[৫]

ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্তমূল্যবোধ, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং বাঙালির প্রতিবাদহীন স্নায়বিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে নজরুল বিদ্রোহের বাণীবীথিকে প্রকাশ করেছেন, যদিও রোম্যান্টিক অনুভববেদ্যতায় মানবমুক্তির অভীপ্সায় তিনি আবেগচঞ্চল। তিনি নৈরাশ্যবাদী নন। ভারতবর্ষের পরাধীনতা তাঁর মতে চিরকালীন নয়; পরাধীনতা 'প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ' বলে তাঁর অভিমত। শৃঙ্খলিত ভারতীয় জাতিসত্তার শৃঙ্খলমুক্তিচেতনায় নজরুল স্নায়ুশক্তিহীন, কর্মবিমুখ, আত্মমর্যাদাবোধশূন্য, কুণ্ডলায়িত মানবকাঠামোর মর্মমূলে করেছেন তীব্র কটাক্ষ। তারুণ্যের বন্দনায় দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তিনি উচ্চারণ করেছেন নির্দ্বন্দ্বে — "দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে।"[৬] অথবা "মা, এখন তোমাকে কুমাতা হইতে হইবে, তোমাকেই আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইতে হইবে।... তোমার রুদ্র মূর্তি দিকে দিকে প্রকটিত হউক।"[৭] তাঁর অভিমত, চাকুরি হচ্ছে অধীনতা, মনুষ্যত্বের বিকিকিনি; ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে জাতি মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে, মানুষ হতে পারে স্বাধীন চিত্তের অধিকারী। 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, অন্তর্সত্তার স্বাধীন শক্তি সৃষ্টি হতে পারে বহির্সত্তার মুক্তির দ্বারা এবং তা সম্ভব চাকুরি নামক দাসবৃত্তি বর্জনের মাধ্যমে। কেবল দার্শনিক যুক্তিতর্কে নয়, নজরুল "বাইরের ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি"[৮] প্রত্যাশী। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন স্ব-অধীনতা। নিজেদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে পরনির্ভরশীলতা হচ্ছে পরাধীনতা, বিদেশী শাসক প্রধান বিবেচ্য নয়। 'আত্মশক্তি' (১৩১২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তিসাধনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেছেন। নজরুলের 'আমার পথ' প্রবন্ধে আত্মনির্ভরশীলতার চরমসত্য উচ্চারিত —

> আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়।[৯]

রবীন্দ্রনাথ 'অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে'[১০] — এই প্রত্যয়ে জ্ঞানকে জীবনের জন্য আপন করতে বলেছেন। দেবতাতুষ্টির জন্য সরস্বতীর চরণে ফুল-জল দিয়ে প্রণামের আচারনিষ্ঠতায় নয়, জ্ঞানে যা অধিগত, যা সত্য তা-ই বাস্তব জীবনের কর্মের সঙ্গে হতে হবে গ্রহণীয়, তাহলেই প্রকৃতপক্ষে সম্ভব জীবনের উত্তরণ, আত্মশক্তিসাধন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যে দার্শনিক বোধ-প্রজ্ঞা-অভিব্যক্তি উন্মোচিত; নজরুলের সম্পাদকীয় রচনায় তা অনুসন্ধান অমূলক, কিন্তু তাঁর মানসচৈতন্যের সত্যসন্ধানী আত্মার যে অকৃত্রিম স্বরের উৎসারণ তার বস্তুমূল্য অসীম। আত্মানুসন্ধানের উদ্ধৃত শব্দপুঞ্জ কেবল রোম্যান্টিক আবেগচৈতন্যের পল্লবগ্রাহিতা নয়; একজন সত্যসন্ধানী মানবমুক্তিচেতনায় উদ্দাম স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের অবিনাশী অমল কণ্ঠ।

আত্মবিশ্বাসে অটল-সোপানচারী নজরুল স্বরাজ সম্পর্কে বলেছেন—

> স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে, নিজেই রাজা বা সবাই রাজা; আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকা তলে আসীন নই।[১১]

স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর এই মুক্তকণ্ঠের প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখ্য, *যুগবাণী* পর্যায়ে নজরুল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন। ধর্মঘট, অসহযোগ, সরকারি চাকরি বর্জন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিসঞ্চারী শিক্ষার কর্মবিন্যাসের মাধ্যমে; যদিও তিনি বিদ্যালয় বর্জনের বিরুদ্ধে

ছিলেন; কিন্তু ১৯২২ সালে গান্ধীর আকস্মিক আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা নজরুলকে বিভ্রান্ত করে। এসময় "দারুণ নৈরাশ্য, হতাশা আর বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া নজরুল চেতনাপ্রবাহে ত্রিবিধ প্রবণতার সৃষ্টি করল : [১] নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস, অনাস্থা; [২] সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন এবং [৩] নৈরাজ্যিক অস্থিরতা।"১২ "যুগবাণী-উত্তর ধূমকেতু-পর্বের রচনায় এই ত্রিধা-বিভক্ত প্রাবন্ধিক মানসের পরিচয় সুস্পষ্ট। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দর্শন নজরুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হলেও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আগাগোড়া নিজেকে মুক্ত রাখার স্বপক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।"১৩ "অহম্-জ্ঞান আত্মজ্ঞান — অহঙ্কার নয়"১৪ এই আত্মপ্রত্যয়ে আত্মশক্তির বিপুল উদ্বোধনে উচ্চারণ করেছেন —

> স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন।... আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশী বুঝবার ভান ক'রে যেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মত হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত হোক কিংবা ঋষি অরবিন্দেরই মত হোক, আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানবো। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানবো না।১৫

আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, সত্যের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তির উদ্ভাসনে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নজরুল অর্পণ করেছেন ভারতীয়ের হাতে। অন্ধ ভক্তির আত্মমুগ্ধতায় গান্ধী-রবীন্দ্র-অরবিন্দের মত গ্রহণের তিনি ছিলেন বিপক্ষে। এমনকি ইংরেজের সহযোগিতায় দেশোদ্ধার হবে মনে করলে আত্মপ্রবঞ্চনা না করে তিনি তাই করতে বলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্গত সত্যের বোধে প্রস্ফুরিত আলোয় উদ্ভাসিত পথই হতে পারে মুক্তির পথ। নজরুলের এই বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২) প্রবন্ধে আত্মশক্তির উপর জোর দিয়েছেন। স্বরাজ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন নিজের দেশকে নিজেই নির্মাণ করে নেবার অধিকার। চরকার সুতো কাটায় স্বরাজ আসবে না, স্বরাজ আসবে 'প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।'১৬ স্বদেশ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অভিমত —

> দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এই জন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।১৭

এই সৃষ্টি সাধিত হয় 'হৃদয়বৃত্তি'; 'বুদ্ধিবৃত্তি'; 'ইচ্ছাশক্তি' অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির সমন্বয়ই পূর্ণশক্তির সৃজনপ্রেরণার উৎস; পলিটিকেল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির সমন্বয় নয়। সমন্বয় বা যোগসাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বলেই রবীন্দ্রনাথের অভিমত। তাঁর চরকা কাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেখানে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'টি কারণে — প্রথমত, অন্ধভাবে আদেশ পালনের

বিপত্তি থেকে তিনি দেশোদ্ধার করতে আগ্রহী, দ্বিতীয়ত, দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে বস্ত্রহীন, সেখানে তিনি কার বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করবেন? রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, সবচেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় সংগ্রাম হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু আত্মস্থ না করা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে। কিন্তু নজরুল এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন যৌবন ধর্মের অমিত উত্তাপ ও একনিষ্ঠা।

> বাঙ্গালীর ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কর্মোন্মাদনা আছে। কিন্তু যা নেই সে হচ্ছে জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা; কিন্তু এই জিজ্ঞাসা না হলে ভেদ বিবাদের মীমাংসা কোন কালেই হয় না। ... স্বরাজ সাধনায় শিশুর মত শুদ্ধি সরলতার আবশ্যকতা আছে, স্বীকার যাই, কিন্তু তার চেয়ে যার বেশী প্রয়োজন সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি ও একান্ত নিষ্ঠা।[১৮]

কেবল 'পোলিটিকাল তুবড়িবাজি'তে নজরুল বিশ্বাসী ছিলেন না। 'বুদ্ধিবৃত্তি'; 'হৃদয়বৃত্তি' ও 'ইচ্ছাশক্তি'র সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ ঋষির বেদমন্ত্রোচ্চারণের মতো স্বরাজ কামনা করেছেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ পল্লি পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় সমাজ নির্মাণের প্রত্যাশী; নজরুল সেখানে কৃষিনির্ভর পল্লিপ্রধান ভারতবর্ষে লাঙল ও চরকাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন পল্লি-সংগঠন, কৃষক-শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকার-সচেতনতা সৃষ্টির প্রসঙ্গে বলেছেন —

> — লাঙলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট-সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না।[১৯]

নজরুল ইসলাম লক্ষ করেছেন ভারতবর্ষের জাগরচৈতন্য বারবার বাধাগ্রস্থ হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আভিজাত্যবোধের প্রাকারে। হিন্দু-মুসলমানের অন্তর্গত ঐক্য সাধনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে নজরুল ছিলেন আন্তরিক। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের ভাষণে নজরুল বলেছেন — ভারতবর্ষের পরাধীনতার পশ্চাতে দায়ী দুই প্রধান সম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলমানের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

> ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি — শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙ্গছে — তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা।[২০]

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক জ্ঞানবিমুখতাকে নজরুল চিহ্নিত করেছেন। সমাজ-অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়ের মানুষ কুসংস্কার, গোঁড়ামি, বৈষম্য, সংঘাত, দাঙ্গায় সভ্যতা-সমাজ-সময়-রাষ্ট্রের গতিশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে; নজরুল সেই সম্প্রদায়-অন্তর্গত সকল মানুষকে রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারের গহন থেকে আলোকিত পৃথিবীতে পদচারণার আহ্বান জানিয়ে বলেন —

> ১. আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে, এক জনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে?[২১]
>
> ২. দেয়ালের পর দেওয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দা খানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম — সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মাজহাবি, ওহাবি ও আরও কত শত দল। ... সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে ফেল।[২২]

আত্মসমালোচনা করে নজরুল উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও উৎস পর্যবেক্ষণ করে তাদের মিলনের অন্তরায়সমূহ অবলোকন করেছেন; উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল গভীর, আন্তরিক ও সদিচ্ছাপূর্ণ। ১৯১৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে হিন্দুকে দোষী করে বলেছেন — এ দেশের ধর্ম আচার সর্বস্ব, অসহনশীল। তাঁর মতে, ধর্ম যতদিন আচার প্রধান থাকবে ততদিন মিলন সম্ভব নয়। 'বাতায়নিকের পত্র' (১৯১৯) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের আচারমগ্নতাকে নিন্দা করেছেন প্রবলভাবে। এ প্রবন্ধে তিনি আত্মসমালোচনা করে বলেছেন — হিন্দু সমাজ কি বাস্তবিকই মুসলমানকে আন্তরিকভাবে বক্ষে আলিঙ্গন করেছে?

> পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, ... হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে।[২৩]

কেবল স্বসমাজ, স্বধর্ম নয়; রবীন্দ্রানুসরণে নজরুল অন্য ধর্মের কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার আর প্রাচীন প্রথার অবরোধগুলো উন্মোচন করে মানুষের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে সমবায়ী বোধের তরঙ্গে জাগ্রত। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত —

> হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠ রোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে, ...।[২৪]

নজরুল ইসলাম উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাদের পারস্পরিক শাস্ত্র-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক অজ্ঞানতা। তিনি 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, হিন্দু যেমন আরবি-ফারসি-উর্দু জানে না, তেমনি সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে আত্মস্থ করে না, সেখানে আরবি-ফারসি শিক্ষার প্রশ্ন অবান্তর। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত একটি পত্রে নজরুল জানিয়েছেন —"হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে, এ পোড়া দেশের কিছু হবে না... ।"[২৫]

উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য নজরুল সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। কোনো সম্প্রদায়ের চৌকাঠে তিনি মানুষকে বন্দি করেন নি। শৃঙ্খলিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, ভাগ্যহতের জাগরণ, পদানত-শোষিত মানুষের মুক্তি-প্রত্যাশায় তিনি মানুষকে জাতি-ধর্ম-সমাজ-মন্দির-মসজিদ ও গ্রন্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, মানবতার সপক্ষে বাজিয়েছেন সাম্যের সুরধ্বনি। ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় অসাম্প্রদায়িক চেতনাঋদ্ধ নজরুল আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন —

> যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দাখানায়,গীর্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরী-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মত তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।... মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ

> সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে — যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু — তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ![২৬]

বিপুল ঔদার্যে নজরুল ধর্মকে বিবেচনা করেছেন। স্বধর্মের সত্য-সন্ধানীরা অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুসলমান সমাজের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস লক্ষণীয়। বাংলার মুসলমানকে তিনি 'বাঙলার অর্ধেক অঙ্গ'[২৭] বলে বিবেচনা করেছেন 'আমার লীগ কংগ্রেস' প্রবন্ধে। এ কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, হিন্দু বা মুসলমানকে নজরুল কোনো পৃথক জাতিসত্তার অন্তর্গত করে দেখেন নি, দেখেছেন বাংলার সমাজের সামগ্রিক অংশ রূপে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থানকারী মানুষ জাতে-ধর্মে-বর্ণে-গোষ্ঠীতে-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখলে কখনই তারা সভ্যতার মানদণ্ডে নিজস্ব জাতিসত্তাকে গতিশীল একটি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে না। এই বোধ থেকেই নজরুল ইসলাম পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়কে সচেতন হতে বলেছেন। কারণ, মুসলমান ভারতীয় জাতিসত্তার একটি বড় অংশ। সর্বোপরি নজরুল ছিলেন মানবধর্মে বিশ্বাসী। নজরুল-মানসের জৈবসমগ্রের ঐক্যসূত্র তাঁর শিল্পিচৈতন্যের প্রাণধর্মের ঔদার্যের উৎস। তাঁর অভিমত —

> হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া — মানব! — তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম।"[২৮]

কেবল হিন্দু-মুসলমান নয়; বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, অর্থাৎ সকল মানুষকে তিনি সাম্প্রদায়িক প্রাকারের বাইরে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। সকল স্বার্থ-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানুষকে তিনি করে তুলেছেন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে মহীয়ান।

> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গন্ডী কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।[২৯]

সমকালীন রাজনৈতিক অভিঘাত-উত্তেজনা প্রভাবিত নজরুল শিক্ষা বিষয়ক কোনো গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক অভিমত ব্যক্ত করেন নি। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হলে নজরুল উল্লসিত হন। কিন্তু ইংরেজি বিদ্যালয় বয়কটের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তাতে মঙ্গল প্রত্যাশার কিছু নেই বলে তিনি ঘোষণা করেন। বরং জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যিক জাগরণের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ ও স্বজাতির বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রেখে মনুষ্যত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। পরবর্তীকালে নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ের "বিলাতী শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া "স্বদেশী" মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মত"[৩০] শিক্ষা বিস্তার করা হলে নজরুল তীব্র প্রতিবাদ করেন। কারণ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের নির্ধারণকৃত পাঠক্রম স্বজাতির মনুষ্যত্বের অবমাননাকর ও দাসত্ব সৃষ্টির সহায়ক। স্বজাতির বীরত্ব-পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য, কর্মীর ত্যাগ-কর্ম, নির্ভীকের সাহস-সঞ্চারী শিক্ষার পক্ষপাতী নজরুল চেয়েছেন —

> আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।[৩১]

নারী শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণমূলক সুচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। নারী শিক্ষা বিষয়ে ধর্মের প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলো উন্মোচন করে সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি।

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।৩২

নজরুল ইসলামের প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য প্রান্ত তাঁর সাহিত্যচিন্তা। সাহিত্য কী? অথবা সাহিত্য-সম্পর্কিত তাত্ত্বিক উপলব্ধির প্রাজ্ঞ-প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধে অনুপস্থিত। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অন্তর্ভাবনার সুস্পষ্ট অভিমত চিঠিপত্র, অভিভাষণ ও প্রবন্ধে অভিব্যক্ত। একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা তিনি জানেন না এবং জানলেও তিনি মানতে চাননা।৩৩ আর্ট সম্পর্কে 'বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি নিজস্ব প্রেক্ষণভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন—

> তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth) এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়।৩৪

'Beauty is truth, truth beauty' — Keats-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প ও সত্যের অন্তর্সংগতি নজরুলেরও অন্বিষ্ট। এবং শিল্প ও সত্যের সঙ্গে নজরুল সমন্বিত করেছেন চিরন্তন মঙ্গলবোধের দর্শন।

সাহিত্যকে নজরুল মনে করেছেন জীবনচাঞ্চল্যের অমিত তেজ-তাপ, উল্লাস-উচ্ছ্বাসে গতিশীল একটি শিল্পকর্মরূপে। জড়, নিষ্প্রাণ, নির্জীব সাহিত্য শিল্পোত্তীর্ণ নয় বলে তাঁর অভিমত। 'সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ'৩৫ — এই ব্যক্তিত্বের সুপ্তচেতনায় নজরুল সন্ধান করেছেন তাঁর প্রেরণাদাত্রী 'আমার সুন্দর'কে। এই আমার সুন্দর তাঁর সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় ছোটগল্প, কবিতা, গান, সুর, ছন্দ, ভাব, উপন্যাস, নাটক আর গদ্যে হয়েছে রূপান্বিত। যাকে তিনি 'প্রলয়-সুন্দর'৩৬ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কোনো উচ্চমার্গীয় বিমূর্ত ভাব-কল্পনার অতীন্দ্রিয় বোধে নজরুল তাঁর 'প্রলয়-সুন্দর'কে আহ্বান জানান নি। 'কবিতা কল্পনালতা'র রাবীন্দ্রিক চেতনার বহির্দেশে নজরুল বাস্তবতাবোধের স্বাভাবিক প্রবণতায় উপলব্ধি করেছেন যিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণবিদ্বেষহীন উদার উন্মুক্ত আকাশের মতো ব্যক্তিত্বচেতনার সত্যে উদ্দাম-চঞ্চলতায় "সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন তিনিই বড় সাহিত্যিক। নজরুলের অভিমত 'সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারেনা। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, ... এই রূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনীনতা।"৩৭ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, ক্ষুধাতুর মানুষের মর্মযন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশই হলো সাহিত্য। একারণে "গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি-না তা আজও বলা দুষ্কর"৩৮ — এই অভিমত প্রকাশে নজরুল নির্দ্বন্দ্ব।

যদিও আপাতপক্ষে নজরুল-প্রবন্ধের এই বিষয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়খণ্ডের কালকবলিত, কিন্তু "ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সর্বশ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণ, বিবেকহীন মানুষের আধিপত্য প্রভৃতি

দিকগুলি আমাদের সমাজ থেকে আজও নির্বাসিত হয় নি বলে সাময়িক হিসাবে চিহ্নিত করার কোন কারণ নেই।"৩৯ বরং ঔপনিবেশিক ক্ষমতায়নের নতুন নতুন উপকরণ প্রয়োগ ও মেরুকরণে মানবিক উৎকেন্দ্রিকতা, বিনাশী মূল্যবোধ, হতাশা-নৈরাশ্য নিমজ্জিত জাতিসত্তার পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষায় নজরুলের প্রবন্ধ সময়-পরিসর অতিক্রমী কালান্তরের স্মারক।

তিন

নজরুলের প্রাবন্ধিক গদ্যের অন্তর্সংহতি অথবা শিল্পমূল্য বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন সমকালীন ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উপযোগিতার মধ্যে রচনাগুলির জন্মউৎসের প্রসঙ্গ। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বদেশের মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্র-দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ-জটিলতা-অস্থিরতা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি তাঁর আবেগচঞ্চল ও উচ্ছ্বাসময় সৃষ্টিমগ্ন কবিচৈতন্যের অহংবোধে রচনা করেছেন সম্পাদকীয়-প্রবন্ধ। যে কারণে "তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনাপ্রবাহের প্রতিবাদ, প্রত্যাশা, আবেগ-ভাবাবেগ, ক্ষোভ, অস্থিরতা, বোধ-প্রজ্ঞা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং তার রূপান্তর ও আধ্যাত্মিক পরিণতি বহু সমালোচকের প্রত্যাশিত পূর্বশর্তকে তৃপ্ত করে না সত্য, তবে তা মর্মান্তিক হলেও নিগূঢ়ভাবে কালাশ্রয়ী ও ইতিহাসের স্রোতশৃঙ্খলিত।"৪০ যেহেতু তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংকলন, একারণে একটি নির্দিষ্ট পরিসর-অন্তর্গত সীমার মধ্যে তা সমাপ্ত করতে হয়েছে। আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত হওয়ায় অধিকাংশ প্রবন্ধে দ্রুততার চিহ্ন স্পষ্ট, আঙ্গিক অবিন্যস্ত এবং অধিকাংশ প্রবন্ধে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ লক্ষণীয়। প্রাবন্ধিক গদ্য নির্মাণে নজরুলের এই অসতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর শব্দসংযোজন, কবিতার ন্যায় অলংকার গ্রন্থনা, বাক্য নির্মাণ, চিত্রকল্প সৃষ্টি অথবা পুরাণ-প্রসঙ্গ ব্যবহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

নজরুলের গদ্যের অন্তর্সংগঠনে শব্দসংযোজনের ক্ষেত্রে রয়েছে স্বতন্ত্র একটি মাত্রা। আরবি-ফারসি-উর্দু, তৎসম, ইংরেজি শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার তাঁর গদ্যের স্বাতন্ত্র্যসৃজনের উৎস। "প্রাক্-নজরুল বাংলা গদ্যে যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার ছিল না, এমনটি নয়। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার আছে, প্যারীচাঁদেও আছে। এমনকি ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরের' পাতায়ও আরবী-ফারসী শব্দ দুর্লক্ষ্য নয়।... বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গদ্যেও আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।... বলাবাহুল্য, নজরুল-গদ্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের যে আন্তরিকতা, দুঃখজনক হলেও প্রাক্-নজরুল যুগের কোন লেখকের রচনাতেই তা' লক্ষ্য করা যায় না।"৪১ নজরুলের গদ্যে শব্দবিন্যাসের দৃষ্টান্ত —

১. উৎপীড়িতের আর্তনাদে, "মজলুমের ফরিয়াদে" আকাশের সারা গায়ে আজ জ্বালা, বাতাসের নিঃশ্বাসে ব্যথা, মাতা বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মধূম।৪২

২. খোশ-আমদেদ! স্বাগত হে দেশবন্ধু! হে বীরেন্দ্র!৪৩

৩. এলোকেশে জীর্ণা শীর্ণা ক্ষুধাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে "মেয় ভুখা হুঁ!"৪৪

উদ্ধৃতিগুচ্ছের শব্দপুঞ্জ আরবি-ফারসি-উর্দু-দেশি অথবা তৎসম যা-ই হোক না কেন, লেখকের চেতনাখণ্ডিত বক্তব্যের অনিবার্য প্রয়োজনই সেখানে মুখ্য। নজরুল ইসলাম শব্দগ্রন্থনা প্রসঙ্গে

অনিবার্যতাবোধ ও আন্তরিকতার অন্তরচৈতন্যের স্থির বিশ্বাসে বলেছেন — "আমি হিন্দু-মুসলমানের পরিপূর্ণ মিলনে বিশ্বাসী; তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।"[৪৫] অর্থাৎ শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি তাঁর মৌল প্রতিপাদ্য নয়, এবং প্রয়োজনের তাগিদে নজরুল "যখন দরকার তৎসম শব্দের উচ্চগ্রামে উঠেছেন, আবার দরকার মত নেমে এসেছেন দেশী শব্দের সাধারণ লয়ে।"[৪৬] শব্দের এই গতিসংযোজনসামর্থ্য, তীব্রতা, বেগ স্নেহকাতরতার সঙ্গে ভীতিকর বীভৎসতা এবং বেদনামগ্ন করুণ অনুরাগের সংমিশ্রণে তাঁর গদ্য পাঠককে উপস্থিত করে দেয় নতুন একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সমবায়ী তরঙ্গে। যেমন —

> নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মা'কে আমার উলঙ্গ ক'রে টেনে নিয়ে চ'লেছে আর চাবকাচ্ছে যে সে দানবও নয় দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চ'লেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী।[৪৭]

এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে ইংরেজি শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদের কতিপয় দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করা হলো।

> ইংরেজি শব্দ :
>
> সোডা-ওয়াটার; কারিকিউলাম; স্টান্ডার্ড; প্রোগ্রাম; আর্টিষ্ট; Larger humanity; Sentiment; বুরোক্র্যাসি; ডিমোক্র্যাসি; morbid ইত্যাদি।
>
> সমাসবদ্ধ পদ :
>
> তড়িৎ-জিহ্বা; বৈতালিক-কণ্ঠ; শরম-রাঙা-পাপড়ি; বনানী-কুন্তল-ষোড়শী; খড়গ-চিহ্নিত-রক্তপথ; রক্তকৃপাণের বিদ্যুৎ-হাসি; অগ্নি-গিরির বিশ্ব-ধ্বংসী অগ্নিস্রাব; শ্মশান-মশান-চারিণী-চণ্ডী; পল্লী-শিশুর ঝর্ণা-হাসি ইত্যাদি।

বিশেষণের ব্যবহার নজরুল ইসলামের প্রাবন্ধিক গদ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রয়োগকৃত বিশেষণগুলি ইন্দ্রিয়প্রসারণক্ষম, অনেকাংশে চিত্রকল্প নির্মাণের সূত্রযোজনাসামর্থ্যে উজ্জ্বল। যেমন—

> পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা; জল্লাদের লৌহ-হস্তের কাঁটার চাবুক; গরল আমাদের তৃষ্ণার জল, দাবানল-শিখা আমাদের মলয়-বাতাস; মৃত্যু-কাতর মুখের যন্ত্রণা আমাদের হাসি; চোখে তার অসঙ্কোচ দৃষ্টির খড়গ-ধার।[৪৮]

সমাসনিষ্পন্ন পদসমূহ এবং বিশেষণগুলি মূলত পরস্পরের পরিপূরক। কখনও একটি সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে বিশেষণ প্রয়োগে পদটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে, কখনও বিশেষণ সংযোজনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সমাসবদ্ধ পদ। ফলে শব্দসমূহ হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। নজরুল তাঁর গদ্যে ব্যবহার করেছেন প্রবাদ প্রবচন —

> এমন করে ক'দ্দিন খাবি, না গোলেমালে যদ্দিন যায়; যে এলো চষে সে রইলো বসে, নাড়া-কাটাকে ভাত দাও এক থালা কষে; বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন; বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী; টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলে বাস;[৪৯]
>
> মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন[৫০]

আশ্চর্য সাফল্যে নজরুল তাঁর প্রাবন্ধিক গদ্যের শব্দপ্রবাহে তরঙ্গায়িত করে দিয়েছেন হিউমার। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, হাস্যরসাত্মক বর্ণনভঙ্গিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সমকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি, সম্প্রদায়নীতির গুরুত্বপূর্ণ জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়াবলি। 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধে নন-কো-অপারেশনকে 'বিছুটি বা আকুসী' এবং আমলাতন্ত্রকে পরিণত করেছেন বিছুটি আক্রান্ত ছাগলের দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য উন্মাদগ্রস্তে। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে পশু ও মানুষের লেজ উপ্ত ও লুপ্ত হওয়া বিষয়ক কথামালায় লক্ষনীয় তীব্র হিউমার। যদিও 'গদাই-লশকরি'; 'খ্যাঁকশিয়ালী'; 'চিচিংফাক'; 'হাঁদাইতে'; 'ঘেঁসড়াইয়া' ইত্যাদি শব্দপুঞ্জ প্রবন্ধের অন্তর্সংহতিকে বিনষ্ট করে, কিন্তু বিষয় উপস্থাপনার কৌশল এবং বক্তব্যের আন্তরধর্মের আন্তরিকতায় তা আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না। বরং আমলাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডকে কটাক্ষ করে নজরুল সপ্তকাণ্ড 'আমলায়ন'[৫১] লিখবার অভিমত ব্যক্ত করলে উন্মোচিত হয় তৎকালীন শাসকশ্রেণীর প্রশাসনতান্ত্রিক জটিলতা। অথবা 'পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে'[৫২] এই উক্তির বহির্বাস্তবতায় যে ব্যঙ্গ এবং হাস্যময়তা তারই অন্তর্বাস্তবতায় প্রস্ফুটিত তীব্র জীবনবোধ; সকল মানুষের সম্মিলিত জীবন যাপনের সুসামঞ্জস্যময়, কল্যাণকামী সুন্দর সুষম সাম্যবাদী সমাজচেতনা প্রবাহের দর্শন।

প্রাবন্ধিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য নির্মাণে আত্মসচেতন প্রাবন্ধিকের স্থিতধী অন্তর্সত্তার উপস্থিতি না থাকলেও কবিচৈতন্যের আবেগময় উপস্থাপন কৌশলে গীতময় পদবন্ধ ও বাক্যযোজনায় নজরুল ইসলাম সৃষ্টি করেছেন সাংগীতিক ছন্দ। কবিতার মতোই প্রবন্ধগুলি উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-অনুপ্রাসময় রচনা-কৌশল তাঁর প্রাবন্ধিক গদ্যের ভাষাবৈশিষ্ট্যের একটি উজ্জ্বল প্রান্ত। যদিও কোনো কোনো প্রবন্ধ আলংকারিক গদ্য আর মিথ-উপকরণের অতিব্যবহারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু জাতীয় অস্তিত্বের অভীপ্সা, শৃঙ্খলমুক্তিচেতনার দীপ্ত অঙ্গীকারে অতীত ঐতিহ্য ও মিথের আশ্রয়ে গদ্যে তিনি বিদ্রোহী মানসপ্রবণতার স্বাক্ষর প্রমূর্ত করেছেন। ফলে প্রবন্ধে এসেছে অনিবার্য গতিময়তা, যা সমকালীন বা নজরুলোত্তর কোনো প্রাবন্ধিকের গদ্যকাঠামোকে করে নি নির্মিত।

তাঁর উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ঝাঁঝালো, তীব্র, তীক্ষ্ণ। অধিকাংশ উপমা রূপান্তরিত চিত্রকল্পে। দৃশ্যময়তার সঙ্গে সংযুক্ত স্পর্শানুভূতি, শ্রুতিময়তা, উপলব্ধি, পৌরাণিকজ্ঞান এবং সাম্প্রতিকতাগ্রস্ত বাস্তবতাবোধের তীব্র আবেগ উপমাগুলিকে দান করেছে চিত্রকল্পের অনিবার্যতা। যেমন —

ক. আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মত গর্জিয়া উঠিতে পারিত?
খ. ঝর্ণার মত ঢেউভরা চপলতা[৫৩]
গ. উদাসিনী এক গভীর অরণ্যের প্রান্তে এসে ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতিনীর মত আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো,
ঘ. সুরের অগ্নি-ঝঙ্কার যেন অবিরাম করাত চলার মত শব্দ করতে লাগল —
ঙ. ঘাতকের হানা খড়গ-রক্ত প্রেয়সীর শরম-রঞ্জিত চুম্বনের মত তাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে রয়েছে।[৫৪]

উপর্যুক্ত উপমাসমূহের প্রথমটিতে আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে স্পর্শানুভূতি এবং শ্রুতিময়তা; দলিত-মথিত সর্পের গর্জনের সঙ্গে ব্যক্তির আত্মঅহংচেতনার সাযুজ্য সন্ধান সংস্থিত হয়েছে চিত্রকল্পে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ঝর্ণার ঊর্মিমালার বস্তুময়তার সঙ্গে চাপল্যের আবেগ যুক্ত। 'গ' সংখ্যক উপমাতে দৃশ্য ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে — ছিন্ন-কণ্ঠ রক্তাক্ত কপোতিনীর আর্তস্বরের সঙ্গে

মানব অস্তিত্বের অন্তর্ক্রন্দন — চিত্রকল্প নির্মাণে নজরুলের উপলব্ধি ও বোধের অপূর্ব সূক্ষ্মতার পরিচয়বাহী। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতি অগ্নিপুঞ্জের বর্ণময়তার সঙ্গে শ্রুতিময়তা সঞ্চার উপমাটিকে দান করে চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা। শেষ উদ্ধৃতিটি রক্তরঞ্জিত খড়গের দৃশ্যায়নে রক্তাক্ত বর্ণময়তার ভীতিবোধের সঙ্গে কণ্ঠ চুম্বনের স্পর্শময় প্রেমজ আবেগ সংস্থাপনে নজরুলের চিত্রকল্প নির্মাণের প্রজ্ঞা, কবিচৈতন্যের কল্পনামাধুর্যে, বিস্ময়কর। আবার —

ক. রক্ত-যজ্ঞের পরের দিন কৈলাসে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা দশহাতে করুণা, স্নেহ আর হাসি বিলাচ্ছে দেখলাম — ৫৫

খ. স্তূপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক! এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ কর, নাশ কর হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা! এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়ভস্ম-টিকা প'রে নবীন বেশে এসে দেখা দাও!৫৬

উদ্ধৃতি দু'টির প্রথমটিতে দশভুজা দুর্গার রক্ত-যজ্ঞ ও অন্নপূর্ণা মূর্তিতে ধ্বংস-সৃষ্টির দ্বৈতসত্তায় নজরুল তাঁর অন্তর্সত্তার অন্বিষ্ট সন্ধানী। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'প্রলয়-ভস্ম-টিকা' শোভিত রুদ্র-সুন্দরের দেবতা শিবের "জটায় যে-প্রলয়ের আহ্বান হলো, তার পরিণামী আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর সুষম সমাজ — নটরাজের জটা-শীর্ষের 'কচি শশী'র কোমল নম্র আলোয় হয়েছে ধ্বনিসংগীত-ছন্দস্পন্দে গভীরতম সংকেতময়, প্রতীকায়িত।"৫৭ স্তূপীকৃত শবের মধ্যে ধ্বংস-সৃষ্টির যুগলসত্তায় শিবের জাগরণের প্রসঙ্গ নতুন চাঁদের আলোর বিমূর্ত রূপকল্পে হাস্যধ্বনির শব্দানুষঙ্গের সংস্থাপন চিত্রকল্পে রেখায়িত।

কোনো কোনো উপমার সঙ্গে নজরুল বিশেষণের পর বিশেষণ সংযোগ করে তাকে বিস্তৃত করে দেওয়ায় ঐ উপমাসমূহ হয়ে উঠেছে ব্যাপক সম্প্রসারিত এবং বহুমাত্রিক। যেমন —

বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয় ...৫৮

উৎপ্রেক্ষা-রূপক-অনুপ্রাসের আশ্চর্য স্বতন্ত্র ব্যবহার নজরুলের প্রবন্ধের গদ্যশৈলীকে করে তুলেছে বিশিষ্ট। নিম্নে বিভিন্ন প্রবন্ধে গদ্যকাঠামোর অন্তর্নির্মিতিতে উৎপ্রেক্ষা-রূপক-অনুপ্রাস সংযোজনের কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো —

উৎপ্রেক্ষা :

তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে; ঝঞ্ঝা যেন মুখে চাবুক খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল; সুরের অগ্নি-ঝঙ্কার যেন অবিরাম করাত চলার মত শব্দ করতে লাগল; পায়ে একরাশ কাঁচা হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করছে, যেন সদ্য-ছিন্ন রক্তজবার জীবন্ত কাৎরানি।৫৯

রূপক :

প্রাণ-শিখা; অগ্নি-কল্লোল; মোহ-ভার; স্মৃতিস্তম্ভ; হিম-নিরেট; কসাই-শক্তি; ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ; মোহজাল; শক্তি-সিংহ; অগ্নি-অজগর; অগ্নি-অশ্রু; গৃহের মঙ্গল-শঙ্খ; পুষ্পের হাসি।৬০

অনুপ্রাস :

বন্ধনভয় রাজভয় বিজেতা বীর; সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী; তরুণ তপস্বীর দল; জ্বালা দিয়ে জ্বালা ও জ্বালাময় বিধি; অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ; প্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নর-কঙ্কাল।৬১

বক্তব্যের অন্তরগ্রাহী-হৃদয়স্পর্শী ও আবেগময় বহিঃপ্রকাশে, কবিতার মতো, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃজনে নজরুলের অন্বিষ্ট উপমান-উৎস মূলত পৌরাণিক-পৃথিবী, প্রকৃতি-পরিসর ও হৃদয়মন্থনজাত আবেগিক শব্দরাশি। তাঁর প্রয়োগকৃত উল্লিখিত উপমান-রূপকল্প ব্যাপক, বহুমাত্রিক এবং অর্থগত বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ — নজরুল এই নির্মাণকৌশল গ্রহণ করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, প্রাণের গভীর মমতায়। অলংকার প্রয়োগের এই স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগের গীতময় বিন্যাস তাঁর ভাষাকে যেমন করেছে সুষমামণ্ডিত তেমনি বক্তব্যকে করেছে মানসঅভীপ্সানুসারী।

নজরুল ইসলামের প্রাবন্ধিক গদ্যে অবলম্বিত ভাষাকাঠামো, বাক্যের গাঠনিক রীতি চমৎকারভাবে বৈচিত্র্যসন্ধানী। সাধু ও চলিত রীতির বাক্য বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সার্থক অথচ ক্রিয়াপদ বিযুক্ত বাক্যিক দৃষ্টান্ত তাঁর গদ্যে সুপ্রচুর। আবার বক্তব্য প্রকাশকৌশল ও বাক্যগঠনেও তাঁর নিজস্ব কাব্যভঙ্গির আদর্শ লক্ষণীয়। *যুগবাণী*র 'জাগরণী' শীর্ষক প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যগুলিতে সাধুভাষা অবলম্বিত হয়েছে। *দুর্দিনের যাত্রী* গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এবং *রুদ্র-মঙ্গলের* 'মন্দির ও মসজিদ' ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধ রচিত হয়েছে চলিত ভাষাকাঠামোকে আশ্রয় করে। *রাজবন্দীর জবানবন্দী*তেও চলিতরীতি লক্ষণীয়। অর্থাৎ ভাষাকাঠামো নির্মাণে নজরুলের গদ্য ক্রমপরিশীলনের স্বাক্ষরবাহী। বাক্যগঠনে নজরুলের বৈচিত্র্যসন্ধানের কতিপয় দৃষ্টান্ত —

ক্রিয়াপদ-বিযুক্ত বাক্য :

১. নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির।[৬২]

২. তোমরা মুক্ত বিশ্বের, তোমরা এ ঘুমন্ত দাস — অলস ভারতের নও।[৬৩]

ক্রিয়াপদ-বিযুক্ত কাব্যভঙ্গির গদ্য :

> আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণ-তূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক।... [৬৪]

কাব্যভঙ্গির আদর্শ :

> বকুল! জা-গো! জাগো বকুল, এই পল্লীমাঠের পথের পাশে মেঠো গানের সহজ সুরে জাগো। জাগো তারই রেশের ছোঁয়ায়।[৬৫]

নজরুল, কবিতার ন্যায় প্রবন্ধেও, যেমন ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্যের নানামাত্রিক বৈচিত্র্যসন্ধানী তেমনি প্রতীচ্য পুরাণকল্প; বাংলার লোকঐতিহ্য; মধ্যপ্রাচ্যীয় ইতিহাস-পুরাণ অনুষঙ্গ এবং ইসলামী ঐতিহ্যের অনুধ্যান সূত্রে তাঁর জীবনবোধের মৌল সত্যস্বরূপকে গেঁথে তুলেছেন। তাঁর ঐতিহ্যধ্যান ইতিহাস আর পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী-অংশের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং ঐতিহ্যের শরীর-কাঠামোর অন্তর্স্রোতে তিনি সংস্থাপিত করেছেন সমকালীন জীবনযন্ত্রণার উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ, খণ্ডিত সত্তার বিচূর্ণিত অস্তিত্বের আর্তি — পুনর্মূল্যায়নের ব্যঞ্জনায় তা বিকিরণ করে নতুন আলো-তাপ। বিভিন্ন প্রবন্ধে পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্রের শক্তিমত্ততায় নজরুল সমকালকবলিত সামাজিক অস্থিরতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তারুণ্যের স্তুতি করেছেন। বেদনা-দুঃখ, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-যন্ত্রণার অগ্নিবাষ্পপরিসর অতিক্রম করে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কলোনিশাসিত সমাজের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সুস্থ সুন্দর

সমাজ নির্মাণের অঙ্গীকারে নজরুল ইসলাম আবেগদীপ্ত, শিব তাঁর সেই প্রাণপ্রেরণার উত্তাপে-উত্তেজনায়-চাঞ্চল্যে সৃষ্টিশীলতার অনুষঙ্গবাহী চেতনা। 'নবযুগ'; 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'; 'তবুড়ী বাঁশীর ডাক'; 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা'; 'স্বাগত'; 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছে?'; 'আমি সৈনিক'; 'রুদ্র-মঙ্গল'; 'আমার পথ' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ রূপায়ণে পৌরাণিক উপকরণমালা ও চরিত্রপুঞ্জের সমন্বয়ে তারুণ্যশক্তির উজ্জীবন, বাঙালি জাতিসত্তার হীনম্মন্যতা, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ লক্ষণীয়। এবং এই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরে নজরুলের প্রতিটি প্রবন্ধই প্রায় একই বক্তব্য ধারণকৃত হলেও স্বাতন্ত্র্যে ঋদ্ধ। আবার অন্তর্প্রবাহে একই কেন্দ্রীয় আবেগ-প্রত্যয় উৎসারণসূত্রে প্রবন্ধগুলি একটি সমন্বয়কৌশলে সামগ্রিকতাপ্রাপ্ত। যে কারণে ঐতিহ্যানুসন্ধানের বর্ণবহুল বৈচিত্র্যময় ব্যঞ্জনাদীপ্ত আয়োজনে নজরুলের প্রবন্ধে আপাত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ব্যাপক ঐক্যসমীকরণের অভিন্ন নান্দনিক মনস্তত্ত্ব সঞ্চরণশীল। যেমন —

> ১. ঐ শোনো, মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো, মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো, ইসরাফিলের শিঙ্গায় নবসৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ... সাগ্নিক ঋষির ঋক্ মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নি-পাথারের অগ্নি-কল্লোলে।[৬৬]
>
> ২. হে আমার ধ্বংসের দেবতা, একবার এই মহাপ্রলয়ের বুকে তোমার ফুলের হাসি দেখাও! স্তূপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক।! এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ কর, নাশ কর হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা![৬৭]
>
> ৩. যে জাগ্রত ওস্‌মান সুপ্ত জগৎসিংহকে ভীম-পদাঘাতে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আমি নমস্কার করি। যে ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগায়, সে ভৃগুকে আমি প্রণাম করি।[৬৮]
>
> ৪. সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সান্ধ্যপ্রদীপ, মড়া-কান্না আর পেচক-শিখাদি রব আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি।[৬৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছে একই বাক্যের শব্দপুঞ্জে নজরুল বন্দি করেছেন তাঁর ঐতিহ্যধ্যানের বিচিত্রমুখী বিচরণশীল চৈতন্যের রূপানুষঙ্গ। ধ্বংস-উন্মাদ শিবের মধ্যে সৃষ্টির উল্লাস রূপময় করে আহ্বান জানিয়েছেন ওসমান, জগৎসিংহ, ভৃগুকে। পুরাণ-ঐতিহ্য-ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক চরিত্রচেতনার বিচিত্রগামিতার অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়ে উঠেছে শিল্পীর দেশ-কালের সীমা-অতিক্রমী সমগ্র চৈতন্যের আধার।

চার

বলা যেতে পারে "ভাবাবেগ, উদ্দাম-ভাবালুতা নজরুলের গদ্যের দুর্বলতার দিক ঠিকই, তবে এটা তাঁর গৌরবেরও কারণ। ভাবাবেগই নজরুলের গদ্যরচনাকে রক্ষা করেছে, বহুলাংশে। আবেগাক্রান্ত পৌরুষ-ঋদ্ধ গদ্য হিসেবে নজরুলের প্রবন্ধগুলি প্রশংসনীয়।"[৭০] যেমন—

> আজ চাই, ভরাট-জমাট জীবনের সহজ, সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও কোন জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা থাকে না। আজ পথের বাধা পাষাণ অটল হিমাচলের মত বজ্রদৃঢ় হলেও সত্য-সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে।[৭১]

প্রাবন্ধিক গদ্যের শব্দপুঞ্জের অন্তর্প্রবাহে এই তীব্রতা, গতিময়তা ও তরঙ্গাবেগের সঞ্চার নজরুলের প্রবন্ধগুলিকে দান করেছে নতুন মাত্রা। গদ্যশৈলী নির্মাণে কাব্যালংকার সংযোজন নজরুলের প্রাবন্ধিক ও কবিসত্তার সুসমন্বয়ে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনায় অত্যুজ্জ্বল। গদ্যকাঠামোর এই পারম্পর্য-সংগতি তাঁর প্রায় সব রচনাতেই লক্ষণীয়। প্রাবন্ধিক বিষয়াবলির সঙ্গে কাব্যিক গঠনপ্রকৌশলের সমন্বয়ে গদ্যের এই নির্মিতি, আবেগ-চাঞ্চল্যের স্বাভাবিক সাবলীলতায় মিথ-ঐতিহ্য-ইতিহাসাশ্রয়ী চরিত্রাবলি-শব্দপুঞ্জ, প্রবাদ-প্রবচন, লোকজ কথামালায় গতি-উত্তেজনা-উত্তাপ-দ্যুতি বিকিরণ সার্থকতায় প্রকরণশৈলীর পৃথকীসত্তার সৃজন নজরুলের একান্তই নিজস্ব এবং প্রজন্মপদচিহ্নহীন অদ্যাবধি।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১

২. ১৩২৯ সালের ১২ মাঘ তারিখের *ধূমকেতু*; ১৩২৯ মাঘের *প্রবর্তক*; ১৩২৯ ফাল্গুনের *উপাসনা* এবং ১৩২৯ ফাল্গুনের *সহচর* প্রভৃতি সাময়িকপত্রে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র মামলায় এই 'জবানবন্দী' আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। পুস্তকাকারে এর দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; কবির ন্যূনতম প্রতিকৃতি-সম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণের দাম ছিল দুই আনা। — গ্রন্থ পরিচয়, *নজরুল রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৩, পৃ. ৭৬৬

৩. *দুর্দিনের যাত্রী* ১৯২৬ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয় বলে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম নির্দেশ করেছেন। — সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন নবী, *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকালের উল্লেখ না থাকলেও *রুদ্র-মঙ্গল* বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বলে আলী আহমদ উল্লেখ করেছেন। এই প্রকাশনা সংস্থা হয়তো বইটির পরিবেশক ছিলেন। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯২৭, *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত।

৫. 'নবযুগ', যুগবাণী, *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭

৬. 'আমি সৈনিক', *দুর্দিনের যাত্রী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬

৭. 'গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ!', *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩

৮. 'সত্য শিক্ষা', *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৩

৯. 'আমার পথ', *রুদ্র-মঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', *কালান্তর*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৬

১১. 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', *দুর্দিনের যাত্রী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮

১২. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'নজরুলের প্রবন্ধ : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭২

১৩. সিদ্দিকা মাহমুদা, 'নজরুলের প্রবন্ধ : সমাজচৈতন্য', *সাহিত্য পত্রিকা*, ছত্রিশ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০০

১৪. 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮

১৫. 'ধূমকেতুর পথ', *রুদ্র-মঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩

১৬. 'স্বরাজসাধন', *কালান্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
১৭. 'সত্যের আহ্বান', *কালান্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১৮. 'মুশকিল', সংযোজন, *নজরুল রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৬, ৭২৮
১৯. 'পোলিটিকাল তুবড়িবাজি', *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
২০. 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা', *নজরুল রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৯৩, পৃ. ১০৪
২১. 'তরুণের সাধনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২২. 'বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
২৩. 'বাতায়নিকের পত্র', *কালান্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৪. 'ছুঁৎমার্গ', *যুগবাণী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭
২৫. প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত পত্র, *নজরুল রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫
২৬. 'মন্দির ও মসজিদ', *রুদ্র-মঙ্গল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭, ৭১০
২৭. 'আমার লীগ কংগ্রেস', *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
২৮. 'ছুঁৎমার্গ', *যুগবাণী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮
২৯. 'নবযুগ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯
৩০. 'জাতীয় শিক্ষা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৫
৩১. 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
৩২. 'তরুণের সাধনা', *নজরুল রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৩৩. *নজরুল-রচনা সম্ভার-১,* হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা (প্রকাশকাল নেই), পৃ. ৩১৫
৩৪. 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান', *যুগবাণী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫
৩৫. 'যদি বাঁশী আর না বাজে', *নজরুল রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৩৬. 'আমার সুন্দর', *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ,* প্রাগুক্ত পৃ. ১২০
৩৭. বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান, *যুগবাণী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫
৩৮. 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য', *নজরুল রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৪০. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'নজরুলের প্রবন্ধ : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৪১. সৈকত আসগর, 'গদ্য-শিল্পী নজরুল', *নজরুলের গদ্য রচনা ভাবলোক ও শিল্পরূপ,* অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ১৯৫, ১৯৬
৪২. 'রুদ্র-মঙ্গল', *রুদ্র-মঙ্গল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩
৪৩. 'স্বাগত', *দুর্দিনের যাত্রী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯
৪৪. 'মেয় ভুখা হুঁ', *দুর্দিনের যাত্রী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮১
৪৫. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'নজরুল-কাব্যে শব্দ ব্যবহার : আবেগ-উদ্দীপনার অনুষঙ্গ', *নজরুল সমীক্ষণ* (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩২৬) থেকে উদ্ধৃত।
৪৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'নজরুল ইসলামের গদ্য রচনা', *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ,* সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন ১৯৯১, পৃ. ১৯৪
৪৭. 'রুদ্র-মঙ্গল', *রুদ্র-মঙ্গল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

৪৮. প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ এবং বিশেষণের উদ্ধৃতিগুচ্ছ গৃহীত হয়েছে *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (প্রাগুক্ত) থেকে।

৪৯. *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. যথাক্রমে - ৬২২, ৬২৭, ৬৪৪, ৬৪৯, ৬৬৫

৫০. 'সত্যবাণী', *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৫১. মুখবন্ধ, *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৩

৫২. হিন্দু-মুসলমান, *রুদ্র-মঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৪

৫৩. 'ক' ও 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি গৃহীত যথাক্রমে 'ডায়ারের স্মৃতি' ও 'বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধ থেকে, *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. যথাক্রমে ৬২৫, ৬৩৩

৫৪. 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য 'মেয় ভুখা হুঁ', *দুর্দিনের যাত্রী*, প্রাগুক্ত, পৃ. যথাক্রমে ৬৮২, ৬৮৩

৫৫. 'মেয় ভুখা হুঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩

৫৬. 'রুদ্র-মঙ্গল', *রুদ্র-মঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

৫৭. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'নজরুলের নটরাজ : বিশ্বছন্দের প্রত্নপ্রতিমা', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

৫৮. 'বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান', *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪

৫৯. *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত ।

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. 'রুদ্র-মঙ্গল', *রুদ্র-মঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

৬৩. 'আমি সৈনিক', *দুর্দিনের যাত্রী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮

৬৫. 'জাগরণী', *যুগবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯

৬৬. 'নবযুগ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭

৬৭. 'রুদ্র-মঙ্গল', *রুদ্র-মঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

৬৮. 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', *দুর্দিনের যাত্রী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯

৬৯. 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫

৭০. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'নজরুলের প্রবন্ধ : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৭১. 'আজ চাই কি', *নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯